Prantik Gabeshana Patrika
Multidisciplinary-Multilingual
Peer Reviewed (Double Blind Referred)
Bi-Annual Research e-Journal

Volume-5 Issue-1 July 2026
International e-ISSN 2583-6706
Website
santiniketansahityapath.org.in

INDEXED IN INTERNET ARCHIVE | GOOGLE SCHOLAR | ORCID | SCRIBD | ACADEMIA

DOI https://doi.org/10.67841/pgp.260501014

OPEN ACCESS

IIFS Impact Factor 3.75

SJIF Impact Factor 3.481

Social evolution and individual ideology in the background of Tarashankar's novels
সামাজিক বিবর্তন ও ব্যক্তিক মতাদর্শ: তারাশঙ্করের উপন্যাসের প্রেক্ষাপট

Dr. Badal Paul
Independent Researcher
Coochbehar
North Bengal

Received on: 26th March 2026
Accepted on: 12th April 2026

Abstract:
This article critically examines the interplay between shifting social paradigms and the personal ideological evolution of Tarasankar Bandyopadhyay, one of the most significant figures in post-Rabindranath Bengali fiction. The study categorizes Tarasankar literary journey into two distinct phases — pre-independence and post-independence — to highlight the tension between his nostalgic affinity for tradition and the inevitable march of modernity. In the pre-independence phase, through seminal works like Ganadevata, Panchagram, and Hansuli Banker Upakatha, Tarasankar portrays the disintegration of the feudal-agrarian structure. The author argues that while Tarasankar was personally rooted in traditional values, his artistic integrity allowed him to document the victory of new social realities over dying customs. Characters such as Banwari and Debu Ghosh embody this tragic yet historic transition, reflecting the artist's struggle to balance individual sentiment with the objective truth of social evolution. In the post-independence phase, the article notes a strategic shift in Tarasankar's narrative focus. Moving away from the gritty realism of contemporary life, he sought refuge in historical romances (Radha, Ganna Begum) and esoteric themes (Nagini Kanyar Kahini). The study suggests that this 'withdrawal' into the past was perhaps a reaction to the disillusionment following the 1947 partition and his increasing proximity to the political establishment. During this period, his personal ideology often eclipsed the socio-political reality, leading to a more romanticized interpretation of history. Ultimately, the article concludes that Tarasankar's oeuvre is a profound testament to an artist's internal conflict — where the "artist of transition" (Sandhi-khoner Shilpi) navigates the turbulence of historical change, leaving behind a legacy that captures the very soul of a transforming Bengal.

Key Words:
Social Evolution, Feudalism, Modernity, Realism, Post-colonial Disillusionment, Tarasankar Bandyopadhyay.

মূল প্রবন্ধ

© Santiniketan Sahityapath

বাংলা উপন্যাসের ধারায় বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎ পরবর্তী অধ্যায়ে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় একটি অবিস্মরণীয় নাম। তিনি তাঁর কালজয়ী সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে এক ধ্রুব নক্ষত্রের ন্যায় বিরাজমান। তারাশঙ্করের সাহিত্য-সাধনার এক বিশাল অংশ অতিবাহিত হয়েছে ভারতবর্ষের ইতিহাসের এক অত্যন্ত সংকটময় ও অস্থির কালখণ্ডে, সেখানে পরাধীনতার গ্লানি আর স্বাধীনতার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা সমান্তরালে প্রবহমান ছিল। এই সময়েই সমাজের পুরনো ধ্যান ধারণা কালের গতিতে প্রবাহিত হয়ে নতুন চিন্তার, চেতনার আবির্ভাব ও বিকাশ নতুন পথ পেয়েছিল। এই ভাঙা-গড়ার তরঙ্গ স্ফুলিঙ্গাকে তারাশঙ্কর তাঁর গল্প-উপন্যাসে স্থান দিয়েছেন। সামন্ততান্ত্রিক কাল থেকে আধুনিক কালকে স্পর্শ করার তাগিদ তাঁর বেশিরভাগ উপন্যাসে পাই। প্রাচীনপন্থীদের, সনাতন ঐতিহ্যের ভাবধারাকে তারাশঙ্কর উপন্যাসে আদর্শায়িত করলেও নতুন কাল তাঁর উপন্যাসে অভ্যর্থিত হয়েছে। তারাশঙ্কর এই দ্বন্দ্বের শিল্পী। মূলত সাতচল্লিশের আগে লেখা উপন্যাসে তিনি তৎকালীন সমাজ বাস্তবতার রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন এবং সেখানে নতুন বিবর্তিত সমাজকে জয়ী করেছেন। কিন্তু সাতচল্লিশ পরবর্তী উপন্যাসে ঔপন্যাসিক বাস্তবের ভিত্তিভূমি থেকে দৃষ্টি স্থানান্তরিত করে ঐতিহাসিক কাহিনির আশ্রয় নিলেন। সেখানে তিনি নিজস্ব মতাদর্শকে জয়ী করলেন বাস্তবতাকে আড়াল করে। আমরা এখানে লেখকের স্বাধীনতা-পূর্ব ও স্বাধীনতা-উত্তর পর্বের উপন্যাসগুলিকে সাধারণ ২টি পর্ব বিভাগ করে বিষয়টিকে পরিস্ফুট করব।

পুরনো ঐতিহ্য নবীন চেতনার দ্বন্দ্ব ও সমাজ পরিবর্তনের ইতিহাস তারাশঙ্করের স্বাধীনতা-পূর্ব পর্যায়ের উপন্যাসে বিস্তৃতি লাভ করেছে। 'চৈতালি ঘূর্ণি' (১৯২৯) থেকে এই পরিবর্তনের ইতিহাস লেখন শুরু হয়েছে। জমিদার-মহাজনী শাসনে গ্রামের সাধারণ কৃষক পরিবারের কৃষিকাজ ছেড়ে কলে কাজ নেওয়ার চিত্রই এই উপন্যাসের মূল। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র রাঢ়ের সদ্‌গোপ চাষি গোষ্ঠ জমি হারিয়ে আধাশহরের ধানকলে চাকরি নিয়েছে। শুধু গোষ্ঠ নয়, তার মতো অবস্থা সমস্ত কৃষকের। ধান কলের চাকরিতেও তাঁরা দেখেন শোষণের অন্য চিত্র। শ্রমিক-স্বার্থ রক্ষার্থে দুজন গান্ধীবাদী শ্রমিক সংগঠকের নেতৃত্বে শ্রমিকরা ওভারটাইম ও মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে ধর্মঘট করে। পিছনে অসহযোগ আন্দোলনের পটভূমি। গোষ্ঠ ভাবে এর থেকে গ্রামই ভালো ছিল। 'সেখানে অভাব থাক, নিদারুণ হতাশা থাক, তবু মমতা ছিল।' গোষ্ঠের দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গো তারাশঙ্করের দীর্ঘশ্বাস কোথাও যেন মিশে যায়। গ্রামীণ সমাজ ব্যাবস্থার প্রতি বিশ্বাস থাকলেও তারাশঙ্কর এই ভাঙ্গানের ইতিহাস লিখতে দ্বিধাবোধ করেন নি। এখানেই উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের সামাজিক দ্বন্দ্ব ও ব্যক্তিগত মতাদর্শের সংঘাত লেগেছে। সংঘাত হলেও বাস্তবকে অস্বীকার করতে পারেন নি তিনি। এরপর 'নীলকণ্ঠ', 'রাইকমল','ধাত্রীদেবতা', 'কালিন্দী', 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'সন্দীপন পাঠশালা' 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা', 'অভিযান' প্রভৃতি উপন্যাসে তারাশঙ্কর সামাজিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাতকে তীব্র থেকে তীব্রতর করেছেন বাস্তবতাকে আধার করে। 'নীলকণ্ঠ' ও 'রাইকমল' উপন্যাসে তারাশঙ্করের বাস্তবতা ও মতাদর্শের দ্বন্দ্ব তেমন ভাবে প্রকাশিত না হলেও অব্যক্ত নয়। 'রাইকমল' উপন্যাসে অজয় তীরবর্তী একদল মানুষ নিজেদের পুরনো বৈষ্ণবীয় গূঢ় সাধনা বিস্মৃত হয়ে যায়নি। উপন্যাস বর্ণনাকারীর মুখে আমরা শুনতে পাই —

> **সে কাল আর নাই। কালের অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। মাঠের বুক চিরিয়া রেললাইন পড়িয়াছে। তাহার পাশেপাশে টেলিগ্রাফের তারে খুঁটির সারি। বিদ্যুৎশক্তি-বহ তারের লাইন। মেঠো পথ পাকা হইয়াছে। তাহার উপর দিয়া উর্ধ্বশ্বাসে মোটর বাস ছুটিতেছে। নদী বাঁধিয়া খাল কাটা হইয়াছে লোকেরা হুঁকা ছাড়িয়া বিড়ি সিগারেট ধরিয়াছে। কাঁধে গামছা, পরনে খাটো কাপরের বদলে বড় বড় গ্রামের ছোকরারা জামা, লম্বা কাপড় পরিয়া সভ্য হইয়াছে। ছ-আনা দশ-আনা ফ্যাশানে চুল ছাঁটিয়াছে। নতুন কালের পাঠশালা হইয়াছে। ভদ্রগৃহস্থ ঘরের হালচাল বদলাইয়াছে, গোলার ধান ফুরাইয়াছে, গোয়ালের গাই কমিয়াছে...।**[১]

সাহিত্য সমালোচক অশ্রুকুমার সিকদার এই বর্ণনার প্রেক্ষিতে মন্তব্য করেছেন — "স্বরভঙ্গি থেকেই বোঝা যায় এই পরিবর্তনের অনেক কিছু লেখকের অভিপ্রেত নয়। ছোকরারা 'সভ্য হইয়াছে' শব্দ ব্যবহারের মধ্যে আয়রনির বক্রতা প্রচ্ছন্ন থাকে না।"[২] যে-কোনো প্রকার 'অতিরেক' বা আতিশয্যের প্রতি তাঁর এক ধরনের অনীহা ছিল। তারাশঙ্করের রাজনৈতিক বিবর্তন ও সামাজিক বীক্ষাকে অনুধাবন করার ক্ষেত্রে 'ধাত্রীদেবতা' এক অনন্য ভিত্তিভূমি। বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসকার ক্ষেত্র গুপ্ত বলেছেন — "তারাশঙ্করের উপন্যসের একটা বিশিষ্ট প্রবণতা দেশকালের মহাকাব্যোচিত পটভূমিতে জীবনের রূপায়ণ, এবং কখনও প্রত্যক্ষ আত্মানুসন্ধান, অথবা ইতিহাসের মধ্যে জাতির জীবনসত্যের উপলব্ধি।"[৩] এই জীবনের রূপায়ণ ও আত্মানুসন্ধান করতে গিয়ে তিনি পুরনো বিচার ও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জাতীয়তাবাদী চেতনার রূপ দেখিয়েছেন 'ধাত্রীদেবতা'য়। পিসিমার সামন্ততান্ত্রিক চিন্তার সঞ্চার শিবনাথের মনে জমিদারতন্ত্রের প্রতি গর্ববোধ করতে শেখায়। তাই উপন্যাসে পিসিমার অন্যায় কার্যকলাপ জেনেও পিসিমা দৃঢ় প্রতাপে জমিদারী

© Santiniketan Sahityapath

চালাচ্ছেন, তার প্রশংসিত বর্ণনা পাই। জনৈক পাঞ্জাবীর কাছ থেকে ঘোড়া কেনার সময় শিবনাথের সামন্ততান্ত্রিক রক্ত স্ফিত হয়ে ওঠে। আর একদিকে মায়ের উদারনৈতিক শিক্ষা শিবনাথকে বিপরীত মেরুতে নিয়ে যায়। তাই প্রজাদের চাষের জন্য জলের আর্জি ও পিতৃপুরুষের সম্পত্তির কথা মনে পড়লে শিবনাথের চোখে জল আসে। লেখক শিবনাথের মানসপটে দুই বিপরীত আদর্শের সংঘাত ঘটিয়েছেন এবং নিজের যাপিত জীবনের দ্বন্দ্বগুলিকে সেখানে প্রতিবিম্বিত করেছেন। উদারনৈতিক চেতনার কাছে ধন-গৌরব ও আভিজাত্যের অহমিকার পরাজয় হয়েছে। তার চিত্র আমরা দেখতে পাই শিবনাথের আভিজাত্যের চিহ্ন কালো ঘোড়াটিকে বিক্রির মধ্যে। এখানে শিবনাথের সমস্ত অহমিকা পরাস্ত হয়ে গরিষ্ঠ জনতার কলরবে মিশে গিয়ে সাধারণ হয়েছে। এর সব কিছুই হয়েছে বিংশ শতাব্দীর বাঁধভাঙা পরিবর্তনের স্রোতে।

‘গণদেবতা’, ‘পঞ্চগ্রাম’ উপন্যাসের যতীনের মধ্য দিয়ে গ্রামের মানুষের মধ্যে চেতনা বোধ জাগ্রত হয়েছে। বন্ধ বিকারগ্রস্থ গ্রাম জীবনে যতীন বাইরের হাওয়া নিয়ে এলো। এই উপন্যাস যুগলে দুইদিকে দুই সমান্তরাল আদর্শ, একদিকে ন্যায়রত্ন মহাশয়ের প্রাচীন আদর্শ অন্যদিকে যতীনের উদারনৈতিক চেতনার সঙ্ক্রমণে উপন্যাসের নায়ক দেবু ঘোষ দোলাচলে থেকেছে। ঐতিহ্য ও আধুনিক আদর্শের দোলাচলতা এই উপন্যাস দ্বয়ের মূল বিষয়। অতীত ছিল সমৃদ্ধশালী — এই বিচারে রাঙাদিদির মুখে শুনতে পাই — “কেত্তন, পাঁচালি, কত হত ভাই! তোরা আর কী দেখলি বল? সে রামও নেই — সে অযুধ্যেও নেই।”[৪] এখানেই চরিত্রের সঙ্গে লেখকের দীর্ঘশ্বাস মিশে যায়। ত্রিশ বছর আগে যে চণ্ডীমণ্ডপ নিত্য গমগম করত, গ্রামের সলাপরামর্শের কেন্দ্র ছিল চণ্ডীমণ্ডপ। হিন্দুরা মুসলমানদের দলিজার সামনে দিয়ে দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জনে নিয়ে যেত, মহরমের মিছিল হিন্দুগ্রামে আসত। কিন্তু অতীতের এই মোহময় বর্ণনা জমিদারী ব্যবস্থার অনেক ধূসর অধ্যায়কে গোপন রাখার চেষ্টা করে। সমালোচক অশ্রুকুমার সিকদার এই প্রসঙ্গে বলেছেন — “ঔপন্যাসিক হিসাবে তারাশঙ্করের মহিমা এইখানে যে সরলতাময় অতীত জীবনের প্রতি নস্টালজিয়া শেষ পর্যন্ত তাঁর বাস্তবতাবোধকে আচ্ছন্ন করতে পারে না।”[৫] উপন্যাসে প্রাচীনপন্থী ন্যায়রত্ন যখন লক্ষ করলেন যে তাঁর পৌত্র বিশ্বনাথ কোনো নিয়মনীতি না মেনে ম্লেচ্ছাচার ও যথেচ্ছাচারে নিমজ্জিত, তখন তিনি বিশ্বনাথকে ত্যাগ করে কাশীবাসী হয়েছেন। পরাভূত অতীতের আর্তনাদে বেদনাবিদ্ধ হয়ে দেবু এখানে বিশ্বনাথের বিরোধিতা করেছে। ক্ষেত্র গুপ্ত তাঁর ‘বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস’ ৪র্থ খণ্ডে এই বিষয়ে বলেছেন — “তারাশঙ্কর সনাতন বিশ্বাসের এমনি অপরিহার্য পতনের ছবি আঁকেন, তার মধ্যে ইতিহাসের পদধ্বনি শুনতে পান, এবং সঙ্গে সঙ্গে পরাভূত অতীতের আর্তনাদে বেদনাবিদ্ধ হন।”[৬] ‘সন্দীপন পাঠশালা’ উপনাসের নায়ক সীতারাম চাষীর ছেলে। কালের রেওয়াজ অনুযায়ী পাঠশালায় পড়তে যায়। তখন তার বাবা রমানাথের মনে হয়েছে পুরুষানুক্রমে রক্ত দিয়ে গড়া কৃষিকর্মের অবসান হলো। নর্মাল স্কুলে ফেল করেও কী করে সীতারাম শিক্ষকতার পেশাকে একমাত্র লক্ষ এবং আদর্শ হিসাবে বেছে নিল সেটাই পর্যালোচনার বিষয়। কোনো প্রেরণার বশবর্তী হয়ে নয়, শিক্ষার প্রতি জৈব আগ্রহেই সে শিক্ষকতার পেশা বেছে নিয়েছে। এই কাজে আর্থিকভাবে তার সহায় হয় ধনী অথচ নিম্নবর্গের মানুষ জ্যোতিষ সাহা। নানা প্রতিকূলতার মধ্যে তাকে পাঠশালা চালানোর কাজ করতে হয়েছে। যখন শিক্ষার আধুনিকতায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলো তখন সে তার বিরোধিতা করেনি। সে বুঝেছে এটাই কালের নিয়ম। ভাঙনসংকুল পরিবেশে সীতারামের সব কিছু ভালো লাগেনি, ভালো লাগে নি তারাশঙ্করেরও। কিন্তু সমস্ত কিছুর পর যখন পরিবর্তনের বাস্তবতা উপন্যাসে স্থান পায় তখন ফুটে ওঠে লেখকের অন্তর্দ্বন্দ্ব।

প্রাচীন ঐতিহ্যের বিলয় এবং নতুন যুগের দ্বন্দ্ব তারাশঙ্করের ‘হাঁসুলি বাঁকের উপকথা’য় শৈল্পিক সার্থকতা লাভ করেছে। নীলকরদের উল্লেখে উপন্যাসের কাল ধরা হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ। সেই সময় উপকথা, উপ-পুরাণের কাল। আর সেই কালে লেখক আমদের নতুন ভাঙনের উপকথা শোনালেন। পুরাতন ও নতুনের দ্বন্দ্বে এখানে অবতীর্ন হয়েছে যথাক্রমে বনওয়ারি ও করালী। করালী কোনো কিছুকেই মান্য করে না, কালারুদ্দের বাহন অজগর সাপকেও পুড়িয়ে দিতে সে পিছুপা হয়নি। মাতব্বরদের কোঠাবাড়ি নেই বলে গ্রামে কেউ কোঠাবাড়ি করতে পারবে না। এর প্রতিবাদ করে করালী কোঠাবাড়ি করতে যায়। প্রথমে সে পিছু হটলেও প্রশাসনের সহযোগিতায় সে কোঠাবাড়ি তৈরি করে। বনওয়ারী এসব দেখে একদিকে করালীর প্রতি বিরূপ হয় অন্যদিকে গূঢ় অপত্যস্নেহ অনুভব করে। বনওয়ারী কাহারদের রোজগারের বিকল্প ব্যবস্থা দিতে না পারলে করালীর নেতৃত্বে কাহারেরা কারখানায় কাজ করতে যায়। বনওয়ারীর পরাজয় ঘটে। সে দেখে কালারুদ্দের থানে যুদ্ধের মোটরগাড়ির আড্ডা বসেছে, কালারুদ্দের বৃহৎ বৃক্ষটি উপড়ে পড়েছে।

© Santiniketan Sahityapath

এসব কিছু দেখে বনওয়ারী ভেবেছে বাবাঠাকুর আর নেই। নিস্তরঙ্গা কাহারপল্লী এখন ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক কাল পরিবর্তনের সাক্ষী। সমালোচক অশ্রুকুমার সিকদার বলেছেন —

> **মহাকাব্যের নায়কের মতো, পুরাণপুরুষ-প্রতিম, পরাস্ত ট্র্যাজিক বনওয়ারীর জন্য, বনওয়ারী যে জীবনাদর্শের প্রতিভূ তার জন্য তারাশঙ্করের দীর্ঘশ্বাস উপন্যাসে গোপন থাকে না; কিন্তু সেই পুরাতন জীবনাদর্শের প্রতি পিছুটান সত্ত্বেও করালীর মধ্যে যে অপ্রতিহত পরিবর্তনের নূতন বাস্তবতা মূর্ত তাকেও রূপায়িত করতে তারাশঙ্কর পিছপা হন না। এই দ্বন্দ্বের শিল্পী তারাশঙ্কর। ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বকে তিনি সামাজিক বাস্তবতার মাত্রায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন, এখানেই তাঁর মহিমা।**[৭]

অতঃপর আমরা তারাশঙ্করের দ্বিতীয় পর্যায়ের উপন্যাসসমূহ নিয়ে আলোচনা করব, যেখানে তিনি জীবন-বাস্তবতার মূলধারা থেকে সরে গিয়ে কোনো এক বিচ্ছিন্ন গোষ্ঠীর গূঢ় আধ্যাত্মিক সাধনা এবং ঐতিহাসিক রোমাঞ্চকর আখ্যানের জগতে প্রবেশ করেছেন। 'তামস-তপস্যা'য় যাযাবর সম্প্রদায়ের সংগীত নৃত্যে নিপুণা লাস্যময়ী রমণীর হিংসা ভালোবাসার চিত্র আছে। 'নাগিনীকন্যার কাহিনী'তে লেখক কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা'র সঙ্গে এই উপন্যাসের সাযুজ্য থাকলেও কাহারদের জীবন যুদ্ধ যেভাবে বাস্তবের উপর দাঁড়িয়ে, বিষবেদেরা তেমন নয়। তারা লেখকের কল্পনার সৃষ্টি। হাঁসুলির যেমন একটা ভৌগোলিক বাস্তবতা আছে হিজল বিলের তা নেই। সমকাল যেভাবে এসে দখল নিয়েছে হাঁসুলীতে নাগিনীতে সেই কালই কাল্পনিক। এইখানেই তারাশঙ্করের দ্বন্দ্বের পৃথক সত্তা। তারাশঙ্করের এই পর্বের উপন্যাস সম্পর্কে ক্ষেত্র গুপ্ত বলেছেন — "দেশ সবে স্বাধীন হয়েছে। তারাশঙ্কর একটা ভবিষ্যৎ আশার বিশ্বাসের, অসংযত বাসনার অবসানে প্রেমে কল্যাণে আধ্যাত্মিকতায় শান্তির কথা প্রচার করার দায়বদ্ধতা অনুভব করেছেন। সর্বদা না হলেও কখনো তা শিল্পকে মেরেছে।"[৮] 'রাধা', 'গন্নাবেগম', 'অরণ্যবহ্নি' ঐতিহাসিক উপন্যাস। কিন্তু ইতিহাসখ্যাত মানুষের চরিত্রচিত্র নেই, শুধু নামোল্লেখ আছে মাত্র। এই বিষয়ে অধ্যাপক সিকদার বলেছেন —

> **নামে ঐতিহাসিক উপন্যাস, কিন্তু তার মধ্যে ইতিহাসের বাস্তবতা নেই, আছে বর্ণাঢ্য রোমাঞ্চ। যে তারাশঙ্কর নিজের কালের বাস্তবতার প্রতি তন্নিষ্ঠ ছিলেন, তিনি স্বাধীনতা-উত্তরকালের বাস্তবতা বর্ণনায় অস্বস্তি বোধ করে স্বপ্নপ্রয়াণ করলেন অতীত ইতিহাসের মধ্যে।**[৯]

কেন তিনি বাস্তবতার বর্ণনায় অস্বস্তি বোধ করলেন সে বিষয়ে সুস্পষ্ট কারণ না থাকলেও আমরা কিছু বিষয় অনুমান করতে পারি। প্রথমত ১৯৪৭ পরবর্তী সময়ে সাম্রাজ্যবাদী শাসনের পতনের ফলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন স্থিমিত হয়ে গেল। যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তাঁর অনেক উপন্যাসের বিষয়বস্তু, সেখানে দেখা দিল দেশীয় রাজনীতির ক্ষমতা দখলের কদর্য লড়াই। স্বাধীনতার উত্তরকালে লড়াই কদর্য থেকে কদর্যতর হয়েছে। যে কারণে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই সতীনাথ ভাদুড়ী পূর্ণিয়া জেলা কংগ্রেসের দপ্তর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন 'রাজকাজ' ছাড়া কংগ্রেসের কিছু করণীয় নেই বলে। কিন্তু তারাশঙ্কর ১৯৩০এ জেল থেকে মুক্তির পর যতই বলুন রাজনীতি নয় সাহিত্যই হবে তাঁর জীবনের ব্রত, তার থেকে তিনি কিন্তু মুক্ত হতে পারলেন না। কংগ্রেসের কাছের মানুষ হয়ে উঠলেন তিনি। ১৯৫২ সালে বিধান পরিষদ ও ১৯৬০ সালে রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন তারাশঙ্কর। এর পূর্বে তিনি কম্যুনিস্ট ভাবাপন্ন প্রগতি লেখক শিল্পী সঙ্ঘের সংস্পর্শে আসেন এবং সমিতির সভাপতিও হন। শিল্পীর ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য ও সৃজনশীলতার অধিকার রক্ষায় আপসহীন থেকে তিনি রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে দায়িত্ব ত্যাগ করেন। অবশ্য এর আরো নানা কারণ আছে — সুভাষচন্দ্রকে কুইসলিং (শত্রুপক্ষের সহযোগী) বলা, পাকিস্থান দাবি বিষয়ে কম্যুনিস্ট পার্টির বক্তব্য প্রভৃতি। কংগ্রেসের সংস্পর্শে থেকে তারাশঙ্কর তাদের বিরুদ্ধাচারণ না করার জন্যও হয়তো তিনি নিজেকে সরিয়ে নিলেন তাঁর সেই সুপ্ত পুরনো ঐতিহ্যে। শাসকের মতাদর্শ সংক্রমিত করল তার নিজস্ব মতাদর্শকে। অধ্যাপক সিকদারের মতে — "এই দ্বিতীয় পর্বের ইতিহাস বেদনাজনকভাবে বাস্তবতা থেকে পশ্চাদপসরনের ইতিহাস। আইডলজি ও বাস্তবতার দ্বন্দ্বে শেষ পর্যন্ত আইডলজিকে জিতিয়ে দুর্ভাগ্যবশত তিনি ব্যর্থ করে দিলেন তাঁর শানিত আয়ুধ। আইডলজির শিকার হলেন তিনি।"[১০]

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, কোনো একটি নির্দিষ্ট গতিপথে লেখকের ভাবনা প্রবাহিত হলেও পরিবর্তনশীল সমাজে সেই ভাবনা দীর্ঘস্থায়ী নাও হতে পারে, থাকতে পারে লেখকের জীবনের নানা ঘাত প্রতিঘাত। নদী যেমন কালে কিছুতে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে তার গতিপথ পরিবর্তন করে, মানুষও সেই কালের আধারে গঠিত সেখানে পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। তারাশঙ্করের জীবনে ও সাহিত্যকর্মে এই গতিপথ পরিবর্তনের ইতিহাস আমরা লক্ষ করতে পারি। গতিপথ পরিবর্তন বললে হয়তো ভুল হবে। রাজনীতি যেখানে সমাজ বাস্তবতার

© Santiniketan Sahityapath

নিয়ামক হয়ে দাঁড়িয়েছে সেখানে মানুষের বিশ্বাসের দৃঢ় ভূমি বিভিন্ন কারণে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে নমনীয় হয়। আর সেখান থেকেই নিজস্ব চিন্তার চেতনার বাঁক তৈরি হয়ে যায়। এইভাবেই আমরা দেখেছি তারাশঙ্করের ব্যক্তিগত মতাদর্শ তাঁর রচনার চরিত্রে অর্পিত হয়ে অপর আদর্শের সঙ্গো বিরোধ ঘটিয়েছে।

তথ্যসূত্র:

১। ‘আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস’, অশ্রুকুমার সিকদার, অরুণা প্রকাশনী, ৭ যুগলকিশোর দাস লেন, কলকাতা ৭০০০০৬, চতুর্থ সংস্করণ, নভেম্বর ২০০৮, পৃ. ১০৩

২। ওই, পৃ. ১০৩

৩। ‘বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস’, ক্ষেত্র গুপ্ত, গ্রন্থনিলয়, ৫৯/১ বি পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, ৪র্থ খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ, মে ২০১৫, পৃ. ৪৯

৪। ‘আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস’, অশ্রুকুমার সিকদার, অরুণা প্রকাশনী, ৭ যুগলকিশোর দাস লেন, কলকাতা ৭০০০০৬, চতুর্থ সংস্করণ, নভেম্বর ২০০৮, পৃ. ১০৭

৫। ওই, পৃ. ১০৮

৬। ‘বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস’, ক্ষেত্র গুপ্ত, গ্রন্থনিলয়, ৫৯/১ বি পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, ৪র্থ খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ, মে ২০১৫, পৃ. ৬৯

৭। ‘আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস’, অশ্রুকুমার সিকদার, অরুণা প্রকাশনী, ৭ যুগলকিশোর দাস লেন, কলকাতা ৭০০০০৬, চতুর্থ সংস্করণ, নভেম্বর ২০০৮, পৃ. ১২২

৮। ‘বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস’, ক্ষেত্র গুপ্ত, গ্রন্থনিলয়, ৫৯/১ বি পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯, ৪র্থ খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ, মে ২০১৫, পৃ. ১০৭

৯। ‘আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস’, অশ্রুকুমার সিকদার, অরুণা প্রকাশনী, ৭ যুগলকিশোর দাস লেন, কলকাতা ৭০০০০৬, চতুর্থ সংস্করণ, নভেম্বর ২০০৮, পৃ. ১২২

১০। ‘আধুনিকতা ও বাংলা উপন্যাস’, অশ্রুকুমার সিকদার, অরুণা প্রকাশনী, ৭ যুগলকিশোর দাস লেন, কলকাতা ৭০০০০৬, চতুর্থ সংস্করণ, নভেম্বর ২০০৮, পৃ. ১২৫

সহায়কগ্রন্থ:

১। নাজমা জেসমিন চৌধুরী, ‘বাংলা উপন্যাস ও রাজনীতি’, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ৭ জিন্দাবাহার প্রথম লেন, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ চৈত্র ১৩৭৮

২। ড. অরুণ সান্যাল সম্পাদিত, ‘প্রসঙ্গা : বাংলা উপন্যাস’, ওয়েস্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, ৪ কলেজ রোড, কলকাতা ৯, প্রথম প্রকাশ ১৯৬০

৩। উজ্জ্বলকুমার মজুমদার সম্পাদিত, ‘তারাশঙ্কর : দেশ কাল সাহিত্য’, মডার্ন বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট, কলকাতা ৭৩, প্রথম প্রকাশ চৈত্র ১৩৬৫

৪। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘বাংলা উপন্যাস : দ্বান্দ্বিক দর্পণ’, পশ্চিমবঙ্গা বাংলা আকাদেমি, ১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ২০, প্রথম প্রকাশ ২০ মে ১৯৯৩

Prantik Gabeshana Patrika

© Santiniketan Sahityapath